পাহাড়ী ভূমি ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির প্রায় ১২% এলাকা পাহাড়ী ভূমি দ্বারা গঠিত। পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু পার্বত্য এলাকার ন্যায় আমাদের পার্বত্য অঞ্চলেও ভূমি ক্ষয়, ভূমিধ্বস অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর এগুলোকে ত্বরান্বিত করে অপরিকল্পিত পাহাড়ের ঢাল ব্যবস্থাপনা, ব্যাপক হারে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন, অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি। পাহাড়ের ঢালে যুগ যুগ ধরে কৃষকগণ জুম চাষ করে আসছে। একসময় আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে জৈব বৈচিত্রের প্রচুর সমাহার ছিল, তখনও পাহাড়ে ২০-২৫ বছর পর পর জুম চাষ করা হতো যা পরিবেশের জন্য তত ক্ষতিকর ছিলনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি লোকের অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা মেটাতে এখন একই জমিতে ৩-৪ বছর পর জুম চাষ করা হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবে মাটিকে পূণরায় উৎপাদনক্ষম হওয়ার পূর্বেই উৎপাদনে যেতে হয়। যার ফলশ্রুতিতে ফসল উৎপাদন বহুলাংশে হ্রাস পায়, পাশাপাশি এর বিরূপ প্রভাব পড়ে পার্বত্য অঞ্চলের জৈব বৈচিত্রের উপর। ত্বরান্বিত করে ভূমি ক্ষয় এবং ভূমি ধ্বস প্রক্রিয়া। এসব সমস্যাবলীকে বিবেচনায় এনে আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পাহাড়ের জীব বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রেখে পাহাড়ী ঢালু ভুমিকে আধুনিক চাষাবাদের মাধ্যমে দীর্ঘকাল উৎপাদনশীল রাখার লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন অতীব জরুরী

প্রযুক্তিসমূহঃ

১) পাহাড়ী অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয়রোধে ঝাড়ের বেড়া (Hedge Row) পদ্ধতিতে চাষাবাদ

২) জুট-জিও (Jute-Geo Textile) টেক্সটাইল পদ্ধতি

৩) গ্যাবিয়ন (Gabion Check Dam) চেকডেম পদ্ধতি

৪) ব্রাশ উড চেকডেম (Brush Wood Checkdam) পদ্ধতি

৫) বেঞ্চ টেরাস (Bench Terrace) পদ্ধতি

৬) মডেল উন্নয়ন (Model Development)

৭) মৃত্তিকা সংরক্ষণে পাহাড়ী ঢালে কন্টুর (Contour)চাষাবাদ এবং "A" ফ্রেমের ব্যবহার:

১) পাহাড়ী অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয়রোধে ঝাড়ের বেড়া পদ্ধতিতে চাষাবাদঃ

প্রজাতি সমূহ :-

ক) গুল্ম প্রজাতি সমূহ :- বগামেডুলা, ডেসমোডিয়া, ইন্ডিগোফেরা (নীল) ও গ্লিরিসিডিয়া।

খ) বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ :- কড়ই, ইপিল ইপিল, শিমুল, মিনঝিরি, বকুল, গামার, মাদার ইত্যাদি।

গ) ঘাস প্রজাতিসমূহ :- নেপিয়ার, ঝাড়ু, খাগড়া, ভেটিভার ও লেমন ঘাস ইত্যাদি।

ঝাড়ের বেড়ার ব্যবস্থাপনা :-

- এক বা দুইবার আগাছা পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়।

- ছাটাইকৃত ডালপালা ফালির উপরের অংশে প্রয়োগ করা যায়। এতে মাটির পুষ্টি নীচের দিকে চলে যাওয়া অবস্থার ক্ষতি পূরণ করে। ঝাড়ের বেড়ার ছাটাইকৃত ডালপালাসমূহ বিশেষত: ফসল চাষাবাদের সময় সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

- আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু অর্থকরী ফসল যেমন - তুঁত গাছ দ্বৈত ঝাড়ের বেড়ার অভ্যন্ড়রে চাষ করা যায়।

ঝাড়ের বেড়া পদ্ধতিতে চাষাবাদের সুবিধা :

- সমোচ্চতা রেখায় ঝাড়ের বেড়া সমন্বিত ফালিতে চাষাবাদ প্রযুক্তির প্রধান উপকারিতা হচ্ছে মৃত্তিকা ও পানি সংরক্ষণ এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ জৈব পদার্থের প্রাপ্যতা যা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও গঠন উন্নত করে।

- এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ ভূমির উন্নত ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।

- এ পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে জ্বালানী কাঠের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।

- ঝাড়ের বেড়া পদ্ধতিতে চাষাবাদের ফলে কৃষকের পশু খাদ্যের যোগান দেয়।

- এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে অবক্ষয় প্রাপ্ত ঢালু জমির পুন: উৎপাদনশীলতা ফিরিয়ে আনা যায়।

ঝাড়ের বেড়া পদ্ধতিতে চাষাবাদের অসুবিধা :

- এ পদ্ধতিতে চাষাবাদে তেমন বড় ধরনের কোন অসুবিধা নাই। তবে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে চাষাবাদ পদ্ধতির তুলনায় এ চাষাবাদ প্রযুক্তিতে বেশী শ্রমের প্রয়োজন হয়। এ প্রযুক্তি গ্রহনের পূর্বে চাষীগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে এ পদ্ধতিটিতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় যা উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ সুযোগ এবং অধিক আয়ের সুবিধা নিয়ে আসবে।

উপসংহার

গবেষণায় দেখা গেছে যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে ঝুম চাষ করলে প্রতি বছর ৪৫ টন/হে: মাটি ক্ষয় হয়। এই চাষাবাদে ক্ষয়রোধের জন্য পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়ি কন্টুর লাইন বরাবর ঝাড়ের বেড়া দ্বারা উল্যেখযোগ্য পরিমান মাটি ক্ষয়রোধ করা সম্ভব বলে গবেষনায় প্রতিয়মান হয়েছে। এত দেখা যায় যে এই প্রকার ব্যবস্থাপনায় ভূমি ক্ষয়ের পরিমান প্রতি বছর ৪৫ টনের স্থলে ৬ টনে নামিয়ে আনা সম্ভব। উপরোক্ত ঝাড়ের বেড়া হতে প্রায় ২৬ টন/হেক্টর সবুজ সার প্রতি বছর পাওয়া সম্ভব। এছাড়া এই প্রকার বেড়া রক্ষনাবেক্ষনের জন্য প্রতি বছর হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত দুই হাজার টাকা খরচ হলেও রোধকৃত মাটির পুষ্টি উপাদানের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

জুট-জিও টেক্সটাইল পদ্ধতিঃ

- স্বল্প খরচে ধ্বসে যাওয়া বা প্রায় ধ্বসে যাওয়া ভূমি পুণরুদ্ধারের জন্য এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে ধ্বসে যাওয়া বা প্রায় ধ্বসে যাওয়া পাহাড়ে পাটের চট বিছিয়ে তার উপর জীবন্ত খুঁটি (মাদার, কাফুলা, গি-রিসিডিয়া, ইত্যাদি) রোপণ করা হয়। বর্ষার শুরুতে ধ্বসে যাওয়া জায়গায় চটের আচ্ছাদনের বিভিন্ন জায়গায় গর্ত করে আচ্ছাদন তৈরীকারী গাছের বীজ দেওয়া হয়। এতে পুরো এলাকা দ্রুত আচ্ছাদিত হয়ে মাটির উপর আবরণ তৈরী করে যা মাটিকে স্থায়ীত্ব প্রদানে সহায়তা করে। তাছাড়া পরবর্তীতে এক থেকে দুই বছরের মধ্যে ভূমি স্থায়ীতব লাভের পর সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ, বনজ গাছ-পালা লাগানো যায়।

- এ পদ্ধতি সম্পাদনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রতি বর্গ মিটারে ৩০০-৩৫০ টাকা খরচ হতে পারে। ধ্বসে যাওয়া এলাকা দিয়ে যাতে পানি প্রবাহিত হতে না পারে সেজন্য ধ্বসে যাওয়া এলাকার উপরের অংশ দিয়ে ঈড়হঃড়ঁৎ এৎধংংবফ ডধঃবৎধিুং বা ঘাসের নির্গমন নালা তৈরী করে দিতে হবে।

সুবিধা

১। ধ্বসে যাওয়া ভূমির স্থায়িত্ব প্রদান করে।

২। বেশি কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

৩। প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য।

৪। ২-৩ বছরের মধ্যে পুণরুদ্ধারকৃত জায়গায় ফলজ-বনজ গাছপালা লাগানো যায়।

৫। খরচ তুলনামূলক কম।

৩) গ্যাবিয়ান চেক ডেমঃ

ভূমি পূণরুদ্ধারের জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে নালা ও রাস্ড়র ঢাল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বিশেষভাবে কার্যকরী। মূলতঃ এটি একটি নমনীয় জাতীয় যান্ত্রিক পদ্ধতি। এই জাতীয় বাঁধ নির্মাণের জন্য ১০ নং জিআই তার এবং স্থানীয়ভাবে আহরিত পাথর ব্যবহৃত হয় বিধায় প্রত্যন্ড় অঞ্চলেও এই জাতীয় স্ট্রাকচার নির্মাণ করা যায়। জি আই তারের খাঁচায় সুবিন্যাস্ড়ভাবে সাজানো পাথরগুলি ঢালের উপরের প্রান্ড় থেকে পানি বাহিত মাটিকে আটকানোর মাধ্যমে ভূমি ক্ষয় রোধ করে। উপরের অংশ হতে আগত পানি নিরাপদে নিষ্কাশনের জন্য এখানে স্পীলওয়ে রাখা হয় এবং নিচের অংশে ক্ষয় প্রতিরোধের জন্য এপ্রোন ব্যবস্থা করা হয়। ধ্বসে যাওয়া এলাকা দিয়ে যাতে পানি প্রবাহিত হতে না পারে সেজন্য ধ্বসে যাওয়া এলাকার উপরের অংশ দিয়ে ঈড়হঃড়ঁৎ এৎধংংবফ ডধঃবৎধুিং বা ঘাসের নির্গমন নালা তৈরী করে দিতে হবে। গালির নীচের অংশে বিভিন্ন প্রজাতির হেজ যেমন- ঝাড়ু, বাঁশ, ইত্যাদির লাইন স্থাপন করতে হবে।

সুবিধাঃ

১। এ পদ্ধতিতে মাটি ক্ষয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

২। গালি নিয়ন্ত্রনের জন্য এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি।

৩। স্থানীয়ভাবে আহরিত পাথর এবং জিআই তার দিয়ে এ পদ্ধতি সম্পাদন করা যায়।

৪। এ পদ্ধতি যান্ত্রিক পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে কাজ করে।

৫। খরচ তুলনামূলক কম।

৪)ব্রাশউড চেকডেম পদ্ধতিঃ

ব্রাশউড চেকডেম রান অফ এবং মাটি ক্ষয়ে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়ায় জীবন্ত খুঁটি (কাফুলা, মাদার, গিসুরিসিডিয়া, ইত্যাদি) দুই সারিতে এক মিটার দূরত্বের গালির আড়াআড়ি বসানো হয়। দুই সারির মাঝখানে ছোট ছোট গাছ-পালা, মাটি ভর্তি ব্যাগ ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্ষয়রোধ ছাড়াও ভূমি ধ্বস নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এই প্রক্রিয়ায় নির্মাণ ব্যয় প্রতি মিটারে ১৫০০-২০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

সুবিধাঃ

১। এ পদ্ধতি সহজ।

২। তেমন কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন নাই।

৩। খরচ কম হয়।

৪। স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ দিয়ে এ পদ্ধতি সম্পাদন করা যায়।

৫) বেঞ্চ টেরাস পদ্ধতি

মৃদু ও মধ্যম ঢালু পাহাড়ের ঢালে ফসল উৎপাদনের জন্য বেঞ্চ টেরাস একটি উপযুক্ত পদ্ধতি। সাধারণত পাহাড়ী ঢালু জমিতে একবার ফসল উৎপাদন করলে ১৫-২০ বছর সেখানে আর কোন লাভজনক ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। সে ক্ষেত্রে টেরাস পদ্ধতি ব্যবহার করে একই ঢালে প্রতি বছর বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি, মাঠ ফসল, স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদী ফল ফলানো সম্ভব। এ পদ্ধতিতে পানি সেচের ব্যবহার করতে পারলে এক বছরে একাধিক ফসল ফলানো যায়।

এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের ঢালকে সমোচ্চতা রেখা বরাবর ধাপ বা সিঁড়িতে পরিণত করা হয়। টেরাসগুলি পাহাড়ের ঢালের আড়াআড়িভাবে তৈরী করা হয় যাতে বৃষ্টির পানি কম গড়িয়ে যায় এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে একটি লম্বা ঢালের দৈর্ঘ্যকে কয়েকটি ক্ষুদ্র

অংশে বিভক্ত করে ঢালের দৈর্ঘ্য কমানো যায়। এ পদ্ধতিতে মাটি ও পানি সংরক্ষণ করা যায়। উলে-খ্য যে, আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে এ ধরনের কার্যক্রমে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য সরকারীভাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সুবিধাঃ

১। ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রন করা যায়।

২। মাটির পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩। মাটিতে আর্দ্রতা বজায় থাকে।

৪। ঢালের দৈর্ঘ্য কমানো যায় ফলে রান অফ নিয়ন্ত্রন করা যায় ।

৫। যেখানে চাষাবাদ করা কঠিন সেখানে ধাপ কেটে ধাপে চাষাবাদ করা যায়।

৬। পানি সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে সারা বছর ফসল ফলানো যায়।

অসুবিধা

১। কৃষকের পক্ষে এককভাবে করা কঠিন। অনুদান /সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

২। কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

৬) মডেল উন্নয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের প্রধান অমত্মরায় হলো পানি। বর্ষা মৌসুমে দুই মাসের মধ্যেই বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাতের ৯০% শেষ হয়ে যায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে যেমন পাহাড়ী ঢালে অতিমাত্রায় বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে ভূমি ধ্বস ও মৃত্তিকা ক্ষয় সৃষ্টি করে, তেমনি বর্ষার অব্যবহিত পরেই মাটি শুকিয়ে যায়। ফলে একমাত্র বর্ষা মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে এখানে ফসল উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই পাহাড়ী জনগোষ্ঠী তাদেও চাহিদা পূরণের জন্য কর্মশূণ্য দিনগুলিতে নির্বিচারে চালায় পাহাড়ের গাছ-পালাসহ অন্যান্য বনজ সম্পদেও ধ্বংসযজ্ঞ। কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করলে কখনও তাদের কর্মশূণ্য হবার কথা নয়। এই লক্ষ্য নিয়ে মৃত্তিকা ও পানি সংরক্ষণ কেন্দ্র তাদের নিজ এলাকায় তিনটি মডেল উন্নয়ন কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে মাত্র পাঁচ একর পাহাড়ী ভূমিকে ব্যবহার করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের সাংবাৎসরিক যাবতীয় চাহিদা পূরণের একটি আদর্শ রূপরেখা স্থাপন করা যায়।

৭) মৃত্তিকা সংরক্ষণে পাহাড়ী ঢালে কন্টুর (Contour)চাষাবাদ এবং "A" ফ্রেমের ব্যবহারঃ

পাহাড়ী ঢালে চাষাবাদে ভূমিক্ষয় হবে, এ বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। যার ফলে পাহাড়ী ঢালে এক বছর চাষাবাদের পর দ্বিতীয়বার আর সেখানে ফসল খুব একটি হয় না বললেই চলে। তাই পাহাড়ী ঝুমিয়া চাষীরা প্রতি বছর নূতন নূতন জায়গার সন্ধান করে। এই ভূমিক্ষয় প্রক্রিয়াকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদের পূর্ব শর্ত হলো কন্টুর চাষাবাদ।

কন্টুর চাষাবাদের উপকারীতাঃ

(১) মৃত্তিকা ক্ষয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব।

(২) মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে।

(৩) খাদ (Gully) বা নালা (Rill) সৃষ্টি নহওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

(৪) মাটি তার উব্বরতা ধরে রাখতে পারে।

(৫) সর্বোপরি পাহাড়ী ঢাল' কে ধীরে ধীরে ধাপে (Terrace) পরিণত করে স্থায়ী চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব।

কন্টুর কিঃ

পাহাড়ী ঢালের আড়াআড়ি সম-উচ্চতার রেখা বা লাইন'ই হচ্ছে কন্টর লাইন। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বা স্থান থেকে একই উচ্চতা বজায় রেখে পাহাড়ী ঢালের আড়াআড়ি যে রেখা সঞ্চায়মান তাকে কন্টুর রেখা বলে। আর কন্টুর রেখা বরাবর কোন ফসল করা হলে তাকে কন্টুর চাষাবাদ বলে।

কি দিয়ে কন্টুর রেখা সনাক্ত করবেনঃ

পাহাড়ী ঢালে আড়াআড়ি কন্টুর রেখা সনাক্ত করার জন্য সবচেয়ে সহজ একটি উপায় হলো "অ" ফ্রেমের ব্যবহার।

"A" ফ্রেম কিঃ

পাহাড়ী এলাকায় অনায়াসে যে জিনিসটি পাওয়া যায় তো হলো বাঁশ। তিন টুকরা বাঁশ এবং বাঁশের তিনটি টুকরাকে বাঁধার উপযোগী লতা বা রশির সাহায্যে অনায়াসেই "A" ফ্রেম তৈরী করা হয়।

কিভাবে "A" ফ্রেম তৈরী করবেনঃ

প্রথমে দুই মিটারের চেয়ে একটু লম্বা দুইটি সমান দৈঘ্যের বাঁশের টুকরা দুই মিটারের স্থানে সুতলী বা লতা দিয়ে বেঁধে নিতে হবে। তারপর বাঁধর স্থান থেকে লম্বা অংশে বাঁশ দু'ইটকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে এমন স্থান চিহ্নিত করতে হবে। অপর বাঁশের টুকরাটিকে আড়াআড়ি এমনভাবে চিহ্নিত স্থান দু'টির সাথে বাঁধতে হবে যেন বাঁধ থেকে বাঁধের দূরত্ব ঠিক এক মিটার হয়। এখন "A" আকৃতির এই ফ্রেমের শীর্ষস্থানের বাঁধের ঠিক মাঝখান থেকে সুতলী বা লতার সাহায্যে একটি পাথর বা ইটের টুকরা ঝুলিয়ে দিতে হবে। এখন একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফ্রেমটিকে স্থাপন করলে ইটের ঝুলন্ড় দোলকটি স্থির হবে। এ স্থানেও পূবের্র ন্যায় আরেকটি দাগ কাটতে হবে। এবার এ দু'দাগের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানটি হবে দোলকটির ভারসাম্য বিন্দুর স্থান। এ স্থানটিকে ভাল করে দাগাঙ্কিত করতে হবে। এভাবেই পাহাড়ের ঢালে কন্টুর লাইন দেয়ার জন্য উপযোগী একটি "A" ফ্রেম তৈরী হলো।

“A” ফ্রেম ব্যবহারের সুবিধাঃ

(১) এটি তৈরী করতে বাড়তি কোন খরচ হয় না।

(২) পাহাড়ে বাঁশ, লতা এবং পাথরের টুকরার প্রাচুর্য আছে বিধায় ফ্রেমটি মাঠ পর্যায়ে তৈরী করা যায়।

(৩) খুব বেশী কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে না।

(৪) সহজেই ব্যবহার উপযোগী।